19

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কিছু প্রস্তাব

আকমল হোসেন

এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এখন পর্যন্ত কম কথা হয়নি। বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে কথা বলার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী একটা করে শিক্ষানীতি তৈরি করে, আবার তা বাস্তবায়িত না করে বিদায় নেয়। নীতি তৈরি করার সময় তারা বলে 'সাম্প্রদায়িক', 'ঔপনিবেশিক', 'ব্যবহারিক জ্ঞান বিবর্জিত' শিক্ষা ব্যবস্থা বদল করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু যত কথা বলে তার আংশিক কাজও এ পর্যন্ত কোন সরকার করতে পারেনি। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব আমলাদের ফাইলবন্দী হয়ে থাকে। কোন প্রস্তাব গণবিরোধী চরিত্রের কারণে গণঅসন্তোষের মুখে পড়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমালোচনা করা হতো এটা কেরানি সৃষ্টি করে বলে। পাকিস্তান আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলে অভিহিত হতো। পাকিস্তানী জাতীয়তা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সৃষ্টির বাহন ছিল সে ব্যবস্থা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তখনকার নেতৃত্ব শিক্ষার ব্যাপারে অনেক বড় কথা বলেছেন। ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তী সরকারগুলোও শিক্ষা নিয়ে অনেক কথা বললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এরশাদ আমলে মজিদ কমিশন রিপোর্ট বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষার প্রস্তাব করায় প্রবল ছাত্র-বিক্ষোভের মুখে পড়ে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান ক্ষমতাসীনরা এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু উচ্চবাচ্য করেনি। দেখা যাচ্ছে শিক্ষা নিয়ে কথা বলা, প্রস্তাব পাস, অঙ্গীকার করা— এসবই ক্ষমতাসীনদের আর দশটা রুটিন কাজের মতো গণ্য হয়েছে।

শিক্ষা বিষয়ক কোন পরিবর্তনের লক্ষ্য হওয়া উচিত পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ, কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, কোন্ কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে হবে তা খুঁজে বের করা। একজন শিক্ষার্থী কি শিখবে তা নির্ধারণ করার কাজটি সুকঠিন। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার বিষয় ছিল অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাম্রাজ্য কিভাবে রক্ষা করতে হবে তা শেখানো। তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির কোন অবকাশ ছিল না। পাকিস্তান আমলে এসে পাকিস্তানী জাতীয়তা, খাঁটি মুসলমান হওয়ার প্রেরণা দেয়ার জন্য তখনকার সরকার অবিরত চেষ্টা করেছে। বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত ঐ লক্ষ্য থেকে এসেছিল। বাংলাদেশে এসেও দেখা যাচ্ছে, ঘুরেফিরে শিক্ষা পাঠ্যসূচীতে স্বদেশ-স্বসমাজ অনুপস্থিত। প্রথমদিকে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল, ইংরেজী ভাষা ইত্যাদি ব্যাপারে যে র‍্যাডিক্যাল কর্মসূচী নেয়া হলো তা আর ধরে রাখা গেল না। ইংরেজী মাধ্যম স্কুল তো ফিরে এসেছে, ইংরেজী ভাষার ব্যাপারেও এক ধরনের আফসোস, অনুশোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হঠাৎ করে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যাদের এভাবে ধরে-বেঁধে ইংরেজী ক্লাসে ঢোকানো হচ্ছে তাদের স্কুল-কলেজ পর্যায়ে ইংরেজীর ভিত্তি কেমন তৈরি হয়েছে তা ভাবা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, সবাই ইংরেজীটা লিখতে-পড়তে না জানলে দেশের উন্নতির চাকা থেমে যাবে। অথচ মাতৃভাষার অবস্থা কি, কতজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শুদ্ধ করে বাংলায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, তা জানার চেষ্টা হচ্ছে না।

কত নমুনার (Type) শিক্ষা ব্যবস্থাই না চালু আমাদের দেশে, যা থেকে শিক্ষার মান সম্পর্কে কোন সাধারণ গড় ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর ধাপের পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন, কোচিং হোম, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসাসহ অবস্থান করছে। কিন্ডারগার্টেন, কোচিংহোম নামের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কি পরিমাণে অবদান/ক্ষতি করছে তার কোন মূল্যায়ন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পুঁজি ঢালার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বাজার অর্থনীতি দর্শন অনুযায়ী বেসরকারী উদ্যোগে লেখাপড়া প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে হবে বিধায় ভাল হবে— এ থেকেই পুঁজি ঢালা হচ্ছে। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামাজিক পটভূমি যে একটি বিশেষ শ্রেণীর তাতে এ মহার্ঘ্য শিক্ষা সবার জন্য নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা মূলত ধর্মীয় শিক্ষা হিসাবে রয়ে গেছে। এখানে শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবস্থান আবার দরিদ্র পর্যায়ের। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিতদের সামাজিক ভূমিকা অধিকাংশই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদানের সুযোগ এসব শিক্ষালয়ে না থাকায় এগুলো থেকে বেরিয়ে অনেকে আবার সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসছে। এদের সামাজিক অবদান না থাকায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা নিয়ে গভীর ভাবনা করা উচিত।

শিক্ষার কাঠামোগত দিক সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমাদের শিক্ষা কাঠামোর চারটি (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর) ধাপ একজন শিক্ষার্থীর বাইশ-তেইশ বছর বয়সে অতিক্রম করার কথা। সাধারণত ছয় বছরে লেখাপড়া শুরু-এটা হিসাব করে এ বয়সের মধ্যে যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করবে বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে ছাব্বিশ থেকে আটাশ বছরের মধ্যে কোন একটা বয়সে সে শিক্ষা শেষ করছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত তার সময় লাগছে স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ে তথা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের স্বাভাবিক চার বছর দীর্ঘায়িত হতে থাকে বলে এ অতিরিক্ত সময় লেগে যাচ্ছে। উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে কাঠামোগত ত্রুটির কারণে তার দেড় বছর সময় অনর্থক খরচ করতে হচ্ছে। যেমন, স্কুলের শিক্ষা বর্ষ জানুয়ারি-ডিসেম্বর বলে দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষার পর এসএসসি ফাইনাল দেয়া ও ফল প্রকাশ পর্যন্ত তাকে ছয় মাস ব্যয় করতে হচ্ছে। কলেজে এসে সে পরের জুলাই থেকে শুরু শিক্ষা বর্ষে ভর্তি হচ্ছে। অন্যদিকে এইচএসসি ফলাফলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হতে তার আরও এক বছর বসে থাকতে হচ্ছে। এক স্তর থেকে অন্যস্তরে উন্নীত হতে একজন শিক্ষার্থীর যে সময় ব্যয় হচ্ছে সেটা এড়ানো যেতে পারে।

স্কুল থেকে কলেজে শিক্ষা বর্ষের যে ফারাক তা দূর করে একই ধরনের শিক্ষাবর্ষ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, জুলাই-জুন) চালু করা যায় কিনা তা ভাবা যেতে পারে। এক শিক্ষাবর্ষ বারো মাসের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অথচ আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ শিক্ষাবর্ষ বাস্তবে শেষ হতে বারো মাসের বেশি লেগে যায়। ভাববার অবকাশ আছে, বারো মাসের মধ্যে কত মাস পাঠদান করে বছর শেষ হওয়ার আগেই পরীক্ষা কিভাবে নেয়া যায়, তাহলে এসএসসি'র টেস্ট পরীক্ষা শেষে ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হবে না। এইচএসসি'র পড়ালেখা নির্ধারিত দু' বছরের মধ্যে শেষ করে কিভাবে পরবর্তী শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় তার উপায় বের করতে হবে।

উচ্চতর বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে চার বছরের (চিকিৎসা ও আইনের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর) কোর্স দীর্ঘায়িত হয়ে ছয়/সাত/আট বছর লাগছে অবশ্য কাঠামোগত কারণে নয় যতটা তার থেকে অধিক অনির্দিষ্ট কারণে। ছাত্র ধর্মঘট, সন্ত্রাস, পরীক্ষা পিছানোর দাবি— এ ধরনের কারণ দূর করা দেশের রাজনৈতিক স্থিরতার ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে অন্যত্র আলোচনা হতে পারে বলে এখানে কিছু বলতে চাই না।

বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শুরু, পরীক্ষা গ্রহণ, ছুটি ইত্যাদির মধ্যে এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যের কোন মিল নেই। একই পরিবারে দুই ভিন্ন ভিন্ন স্তরগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অমিল, এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু, পরীক্ষা গ্রহণের সময়ের হেরফের, এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই অনুষদের মধ্যে এ ধরনের অমিল সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় জগাখিচুড়ির একটি জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। এক স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ছুটি শুরু হওয়ার পাশাপাশি অপর স্কুলে পরীক্ষা শুরু হলে শিক্ষার্থীদের ওপর কিরূপ মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে, তা বোঝা কষ্টকর নয়। দুই বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া একই শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণের সময়ের হেরফেরে কেউ আগে ডিগ্রী নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে, অন্যজন তখনও ছাত্র জীবন শেষ করতে পারছে না। সমস্ত দেশের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের ক্লাস, পরীক্ষা, ছুটি কার্যক্রম শুরু হলে এ ব্যবস্থায় একটি শৃঙ্খলা আসতে পারে।

শিক্ষা সংক্রান্ত, বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে হঠাৎ করে নেয়া সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই অশুভ ফল বয়ে আনছে। এসএসসি পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে যে সব সিদ্ধান্ত দু'তিন বছর আগে নেয়া হয়েছিল সেগুলো ছাত্র বিক্ষোভের ভিতর দিয়ে বাতিল করতে হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি শুধু নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য চালু না রেখে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করে তোলার জন্য ন্যূনপক্ষে পঞ্চম শ্রেণী থেকে চালু করা উচিত। এ বছর শিক্ষাবর্ষের অর্ধেক পার হয়ে যাওয়ার পর কৃষি বিজ্ঞান চালু করা হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় তড়িঘড়ি করে অন্য বিষয়ে শিক্ষককে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে বিষয়টি পড়ান শুরু করে দেয়া হলো। কৃষি বিজ্ঞান কি শুধু বই পড়ে জানা যাবে? তার জন্য এক টুকরো জমিরও তো দরকার হবে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ফসল ফলানোর ব্যাপারে ব্যবহারিক জ্ঞান দেয়া যাবে। শহরের স্কুল, বিশেষ করে বড় শহরগুলোর তো খেলার মাঠই নেই, তাহলে কৃষি ক্ষেত কোথায় পাওয়া যাবে?

ক্ষমতায় যাওয়ার আগে অন্য বিষয়ের মতো শিক্ষা নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলো কথা বলে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে তাদের কথা বলা উচিত। ক্ষমতায় গিয়েও তাদের এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনাগুলো পরিষ্কার হয় না। মনে হয় তারা এ বিষয়েও স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সময় পার করতে চায়। অথচ 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' নিয়ে আজকাল কত কিছুই না বলা হচ্ছে। আমাদের দেশে তার বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে?